بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

‘আল্লাহ্ তা’লার গুণবাচক নাম ‘নূর’ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা’

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ ডিসেম্বর, ২০০৯-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশঃ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত জুমুআয় বিভিন্ন আভিধানের আলোকে আল্লাহ্ তা’লার গুণবাচক নাম ‘নূর’ এর অর্থ বর্ণনার পর আভিধানিকগণ তাদের কৃত অর্থের ব্যাখ্যার জন্য পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর কয়েকটি আয়াতাংশ উপস্থাপন করেছিলাম। সূরা নূরের আয়াত اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এর উদ্ধৃতি দিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলাম। আজকের খুতবায় আমি সেসব আয়াতের মধ্য থেকে দু’একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করবো। যেভাবে আমি বলেছি, বিচ্ছুরণশীল আলোকেও নূর বলে এবং এ নূরও দু’ধরণের। এক. ইহলৌকিক নূর ও দুই. পারলৌকিক নূর। ইহলৌকিক নূর আবার দু’ধরণের। একটি হলো, সেই নূর বা আলো যা অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে অনুভূত হয়, মুফাস্‌সিরনগণ এর নাম রেখেছেন, মা’কুল অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আলোকে এ নূর পাওয়া যায়। বুদ্ধিমত্তার নূর ও কুরআনের নূর– ঐশী বিষয়াদির অন্তর্গত। অন্যটি হলো, সেই নূর যা চর্মচক্ষে অনুভব করা যায়। একে বলে ‘অনুভব’। যেমন- সেই নূর বা আলো যা চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি ও বিভিন্ন আলোকবর্তিকা হতে পাওয়া যায়। ঐশী নূরের উদাহরণস্বরূপ মুফরাদাতের বরাতে আমি সূরা মায়েদা ও সূরা আন্‌আমের আয়াতের কথা বলেছিলাম। মুফরাদাত চর্মচক্ষুর মাধ্যমে অনুভূত নূরের উদাহরণ দিতে গিয়ে সূরা ইউনূসের ৬ নাম্বার আয়াতের কথা বলেছেন, যেখানে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا অর্থ: তিনি-ই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন এবং চাঁদকে আলোকিত করেছেন। এখানে হয়তো কেউ ভাবতে পারে যে, সূর্যের জন্য ‘যিয়া’ এবং চাঁদের জন্য ‘নূর’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাই ‘যিয়া’ অধিক আলোকিত এবং ‘নূর’ অল্প আলোকিত। আভিধানিকগণও একথাই বলেন, ‘যিয়া’ অধিক আলোকিত এবং স্বল্পালোকিতকে বলে নূর। ‘যিয়া’ ‘নূর’-এর বিপরীতে অধিক শক্তিশালী। ‘যিয়া’ এবং ‘যো’ তাকে বলে যা নিজ সত্তায় আলোকিত হয় এবং সাধারণত যে অন্য কারো কাছ থেকে আলো নেয় তার জন্য নূর শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ তাহলে, এর অর্থ কী? এর উত্তরে মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, নূর শব্দের আরো অনেক অর্থ রয়েছে এবং এই নূর যিয়া অর্থেও

ব্যবহৃত হয়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَسِرَاجًا مُنِيرًا অর্থাৎ, তিনি প্রদীপ্ত সূর্য। এর অর্থ হলো, তাঁর নূরে অন্যরা আলোকিত হবে, যদিও তাঁর নূর আল্লাহ্ তা'লারই নূর।

কাজেই আল্লাহ্ তা'লার নূর বা জ্যোতির যে প্রতিফলন অথবা আল্লাহ্ তা'লার যে ছায়া রয়েছে তা-ই আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়। মহাবিশ্ব সম্পর্কে তখনই প্রকৃত ধারণা লাভ হয় যখন, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নূর এর আলোকে তা দেখা হয়। কেননা, যার সাহায্যে অন্যান্য জিনিস দেখা যায় এমন প্রতিটি জিনিসকে নূর বলে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিলীন হয়ে বাহ্যিক চোখ দিয়েও সেই নূর অর্থাৎ খোদার নূর বিভিন্ন সৃষ্টিতে দেখা যায়। নাস্তিক এসব জিনিসের মধ্যে আল্লাহ্কে দেখতে পায় না পক্ষান্তরে মু'মিন সব কিছুতেই আল্লাহ্কে দেখতে পায় এবং তারা এসব জিনিস থেকে প্রতিনিয়ত কল্যাণমন্ডিতও হচ্ছে।

এরপর পারলৌকিক নূর সম্বন্ধে মুফরাদাতে এ আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا অর্থ: **'তাদের নূর তাদের সম্মুখভাগ ও তাদের ডান দিককে আলোকিত করে চলতে থাকবে এবং তারা আল্লাহর সমীপে মিনতী করবে, হে প্রভূ-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও।'** (সূরা আত্ তাহ্রীম:৯) এ হলো, সেই পারলৌকিক নূর যা তারা মৃত্যুর পর দেখতে পাবে।

এরপর হুযূর বলেন, আমি গত জুমুআয় সূরা মায়েদার একটি আয়াতের অংশ বিশেষ পাঠ করেছিলাম কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয় নি।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ অর্থ: **'হে আহলে কিতাব! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমাদের সেই রসূল এসেছেন যিনি তোমাদের সামনে অনেক বিষয় যা তোমরা তোমাদের কিতাবে গোপন করতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন আর অনেক বিষয় আছে যেগুলো তিনি উপেক্ষা করছেন নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাবও এসে গেছে। আল্লাহ্ তা দ্বারা তাদেরকে যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাদেরকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।'** (সূরা আল্ মায়েদা- ১৬-১৭)

অতএব সেসব কথা যা পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীরা তাদের কিতাবে হয়তো পরিবর্তন করেছে, অথবা গোপন করতো বা প্রকাশ করতো না; সে সম্পর্কে খোদা তা'লা ঘোষণা দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) এখন দ্বিতীয়বার জগতের সামনে সে বিষয়গুলো তুলে ধরছেন। শুধু তাই নয় বরং নতুন শরিয়তে, অনেক নতুন বিধি-বিধানও আছে, এগুলো মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে জগতের সামনে এখন উপস্থাপিত হচ্ছে। খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে সেসব বিষয় প্রকাশিত হয়েছে আর এগুলো এমন যা মানবপ্রকৃতি সম্মত

শিক্ষা, যাতে কোন ঘাটতি বা বাড়তি নেই। এমন এক রসূল এসেছেন যিনি পূর্বেরও নন আর পশ্চিমের ও নন বরং তিনি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক ওহী নবীর প্রকৃতি অনুযায়ী নাযিল হয়ে থাকে, তাঁর প্রকৃতি সম্মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেই নবীর প্রতি ওহী নাযিল হয় তাঁর ফিতরত বা তাঁর প্রকৃতি মোতাবেক ওহী নাযিল হয়ে থাকে। যেমনটি, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃতিতে ছিলো প্রতাপ এবং ক্রোধ, তওরাতও একটি জালালি শরীয়ত যা তার ওপর নাযিল হয়েছে। হযরত মসীহ্ (আ.) এর প্রকৃতিতে ছিলো, সহিষ্ণুতা এবং কোমলতা অতএব ইঞ্জিলের শিক্ষাও কোমলতা এবং নমনীয়তা ভিত্তিক।

কিন্তু মহনবী (সা.)-এর প্রকৃতি ছিল একান্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এমন পর্যায়ে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন যাতে না সীমাতিরিক্ত কঠোরতা ছিল, না নমনীয়তা ছিল। না সকল ক্ষেত্রে তাঁর সহিষ্ণুতা পছন্দ ছিল আর না-ই প্রত্যেক স্থানে তিনি ক্রোধ প্রদর্শন করতেন, না প্রতিটি জায়গায় নম্রতা দেখাতেন, না ক্রোধ প্রকাশ হতো। বরং এমন এক পথ তিনি অনুসরণ করতেন যা সোজা এবং সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ। প্রজ্ঞার আলোকে স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে তিনি (সা.) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও অনুরূপ। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'লা একস্থানে বলেন: جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ অর্থ: **'মন্দের পরিণাম ততটুকুই, যতটুকু সে মন্দ কর্ম করেছে। কিন্তু যদি কেউ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে তাহলে তার প্রতিদান খোদা তা'লার হাতে।'** (সূরা আশ্ শূরা:৪১)

হুযূর বলেন, এ হলো ইসলামের সুমহান শিক্ষা যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। পাপাচারী ব্যক্তির চারিত্রিক সংশোধনই হলো শাস্তির মূল উদ্দেশ্য। যদি ক্ষমা, কারো সংশোধনের কারণ হয়, আর স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আসে তাহলে ক্ষমা করাই উত্তম। আর যদি শাস্তিই তার সংশোধনের মাধ্যম হয় তাহলে শাস্তি দেয়া আবশ্যক।

কোনক্রমেই এটি ইসলামের শিক্ষা নয়, ডান গালে থাপ্পর খেয়ে বাম গাল পেতে দাও। আবার এও নয় যে, চোখের বদলে চোখ অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে। বরং ইসলাম স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অনুপম শিক্ষা প্রদান করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় হুযূর বলেন, দেখো! এ আয়াতে দু'টি পথেই খোলা আছে। মার্জনা এবং ক্ষমা সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, এটিই প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যার ভিত্তিতে বিশ্বব্যবস্থা চলছে। তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছেন যিনি সকল পুরাতন বিষয় এবং নতুন বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটা বলার পর খোদা তা'লা বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ অর্থ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন এবং প্রাঞ্জল গ্রন্থও এসেছে। এই নূর যার কথা এখানে বলা হয়েছে, তা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা– যার দৃষ্টান্ত আমি পূর্বেই তুলে ধরেছি।

খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুয়তের নূরকে বন্ধ নয় বরং সেই নূরকে আরো উজ্জ্বল ও বিস্তৃত করতে চেয়েছেন। এই হলো খতমে নবুয়তের মর্যাদা, এটা এমন আধ্যাত্মিক আলো যা পুনরায় সর্বোচ্চ আলো সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু যেভাবে খোদা তা'লা বলেছেন, এই নূরের সাথে সুস্পষ্ট কিতাব অর্থাৎ আল্ কুরআনও রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নূরে মুহাম্মদ (সা.) এবং নূরে কুরআনকে নিজের এক পঙ্কতিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন, **'যিনি আকাশ থেকে নূর নিয়ে এসেছেন– তিনি স্বয়ং নূর ছিলেন। অসভ্য জাতির মাঝে জন্ম নিয়েছেন- তাতে কি যায় আসে? শত্রুরা আপত্তি করে নিরক্ষর, অশিক্ষিত জাতির এক ব্যক্তি শেষ নবী হবার দাবী করে। যে নিজেও অশিক্ষিত বা পড়ালেখা জানে না।'**

তিনি (আ.) বলেন- এটিতো আপত্তির কোন বিষয়ই না। কেননা, এটি তাঁর সম্মানকে বৃদ্ধি করছে। মহানবী (সা.) আকাশ থেকে সেই পরিপূর্ণ নূর নিয়ে এসেছেন যা বন্য পশুকে মানুষ বানিয়েছে, আর মানুষকে নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ ও খোদাপ্রাপ্ত মানুষ বানিয়েছে। ঐ অসভ্য জাতি যখন সেই নূর থেকে অংশ পেলো আর কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করতে আরম্ভ করলো- তখন তারা জগতের সবচেয়ে সম্মানিত জাতিতে পরিণত হয়ে গেলো। আজ বিশ্বের দরবারে ইউরোপ– শিক্ষার আলোয় আলোকিত। কিন্তু সাহাবীরা (রা.) মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআন থেকে নূর লাভ করে এদের চেয়ে সহস্র বছর পূর্বেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার সনদ ছিলেন। ইউরোপ এই জ্ঞান তাঁদের কাছ থেকেই শিখেছে। কাজেই শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয় বরং জাগতিক উন্নতির জন্যও তাঁরা আলোকবর্তিকা ছিলেন।

কাজেই আজ মুসলমানদের চিন্তা করা উচিত। সেই নূর, যা, গোটা বিশ্বকে আলোকিত করেছে; তা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিক থেকে হোক অথবা জাগতিক জ্ঞানের দিক থেকে হোক; তা আজ কেনো তাদের মাঝে দেখা যায় না। আল্লাহ্, রসূল ও কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে ঠিকই, তবে তাদের মাঝে এ নূর দৃষ্টিগোচর না হবার কারণ কী?

হুযূর বলেন, আমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট, যে ব্যক্তি এ যুগে সেই নুরের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হয়েছেন তাঁকে অস্বীকার করা হয়েছে। একই সাথে আহমদীদের জন্য এক্ষেত্রে চিন্তা ও ভয়ের বিষয় রয়েছে। কেবল মৌখীকভাবে মানার দাবী করেই নুরের অংশ পাওয়া যায় না। এ কুরআনী নূরের অংশ পাবার জন্য পরিপূর্ণ মানবের নিষ্ঠাবান প্রেমিকের বর্ণনাকৃত শিক্ষা ও কুরআনের নীতির উপর চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক। পার্থিবতায় নিমজ্জিত হয়ে আলো অন্বেষণ করবেন না, বরং কুরআন মজীদের শিক্ষায় নিমগ্ন হয়ে প্রজ্ঞার মণিমানিক্য অন্বেষণ করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক এবং বিশ্বাবাসীকে প্রকৃত আলোয় উদ্ভাসিত করা আবশ্যক।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার এখন মহানবী (সা.)-এর সত্তা ও কুরআনের মাঝেই নিহিত। কিন্তু একে বুঝার জন্য চোখেও নূর সৃষ্টি করা আবশ্যক। চোখে জ্যোতি সৃষ্টি করা এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অতএব সৌভাগ্যশালী তারা, যারা এ নূরকে অর্জনের জন্য তিনি (আ.) কর্তৃক নির্ধারিত বয়'আতের শর্তগুলো যথাসাধ্য পালন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ মর্যাদা কীভাবে পেয়েছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: **'আমি সদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি! এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.) {তাঁর প্রতি হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক}। এই নবী, কতো বড় মর্যাদার অধিকারী! তাঁর সুমহান মর্যাদার পরম মার্গ কল্পনাতীত। তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা মানুষের সাধ্যাতীত। পরিতাপ! তাঁর মর্যাদা যেভাবে শনাক্ত করা উচিত ছিলো, সেভাবে শনাক্ত করা হয় নি। সেই তৌহিদ যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ– যিনি পুনরায় একে ধরাপৃষ্ঠে ফিরিয়ে এনেছেন। খোদা তা'লার সাথে তাঁর পরম ভালবাসা ছিলো। আর মানবজাতির ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছিলো একান্ত ব্যাকুল। তাই, খোদা তা'লা যিনি তাঁর হৃদয়ের গোপন রহস্য জানতেন- তিনি তাঁকে পূর্বাপর সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য– তাঁর জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করেছেন। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। আর যে ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হওয়াকে স্বীকার না করে কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকে দেয়া হয়েছে। সকল তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার তাঁকেই প্রদান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে এটি লাভ করে না- সে চিরবঞ্চিত। আমরা কি, আর আমাদের মূল্যই বা কি? আমরা প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) এ নবীর মাধ্যমেই পেয়েছি, আর জীবন্ত খোদাকে এই পরিপূর্ণ নবী ও তাঁর নূরের কল্যাণে লাভ করেছি, খোদা তা'লার সাথে কথপোকথন ও বাক্যালাপের সম্মান; যদ্বারা তাঁর দর্শন পাই তা এই বুযুর্গ নবীর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি, যদি একথা স্বীকার না করি– তাহলে আমরা অকৃতজ্ঞ হবো। সেই হেদায়াতরূপী সূর্যের কিরণ রৌদ্রের মতো আমাদের উপর পতিত হয়, আর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোকিত থাকবো যতক্ষণ আমরা এর সামনে দন্ডায়মান থাকবো।'** (রূহানী খাযায়েন-২২তম খন্ড- হাকীকাতুল ওহী-পৃ:১১৮-১১৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উদ্ধৃতি থেকে মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা প্রাঞ্জলভাবে প্রতিভাত হয়। যদি ফিতরত বা প্রকৃতি নেক হয় তাহলে তাঁর (আ)-এর প্রতি আপত্তিকারীদের জন্য এটি যথেষ্ট উত্তর। মহানবী (সা.)-এর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর কোন মর্যাদা নেই। আমরা তখন পর্যন্ত খোদা তা'লার নূর থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে থাকবো যতক্ষণ হেদায়াতরূপী সূর্যের সামনে দন্ডায়মান থাকবো।

খুতবার শেষাংশে হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনার আলোকে সিরাতে মুস্তাকীম এর ব্যবহারিক এবং জ্ঞানগত দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং আহমদীদেরকে পার্থিব ক্রীড়া-কৌতুক ও লোভ লালসা থেকে মুক্ত হয়ে সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হবার জন্য ঔদাত্ত আহবান জানান।

হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৌভাগ্য দিন, আমরাও যেন এ প্রকৃত নুর অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি আর আমাদের জীবনকে যেন এই নূর দ্বারা জ্যোতির্মন্ডিত করতে পারি। আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, ইউ,কে)